Deba Prasad Das

" তমন্না " ঃ মানা থেকে মান্না

কলকাতা থেকে আসা এত এতসব বিখ্যাত মানুষদেরকে নিয়ে কয়েকদিনের মধ্যেই শুরু হয়ে গেল লক্ষ্মী প্রডাকশনের প্রথম ছবির যাবতীয় কাজ। ছবির নাম -" তমন্না।" পরিচালক ফনী মজুমদার এবং সংগীত পরিচালক কৃষ্ণচন্দ্র দে। আমি তো তখন আর নেহাত কাকার পরিচর্যার পরিচালকই শুধু নই, সেই সঙ্গে রীতিমতো দেড়শো টাকা মাস-মাইনেতে তাঁর সেকেন্ড এ্যাসিস্টেন্ট মিউজিক ডাইরেক্টরও বনে গেছি। এখনকার হিসেবে টাকার অঙ্কটা আক্ষরিক অর্থেই রসিকজনের নস্যি খরচ বলে মনে হলেও,তখনকার দিনে অর্থাৎ এখন থেকে পঞ্চাশ বছর আগে দেড়শো টাকা মাইনে পাওয়া,বিশেষত আমার মতো ওরকম নগন্য এ্যাসিস্টেন্টের পক্ষে সেটা ছিল খুব গর্ব করার মতো খবর। আমি তখনকার কথা বলছি যখন ৩/৪ টাকা মন চাল পাওয়া যেত এবং একখানা সুপার ফাইন ধুতি পাওয়া যেত মাত্র ৩/৪ টাকায়। তবে টাকা যেমন পেতাম , কাজও করতে হত অসম্ভব। গানের নোটেশন করা থেকে শুরু করে শিল্পীদেরকে গান তোলানো, মিউজিক এ্যারেঞ্জ করা এই সমস্ত কিছুই করতে হত আমাকে এবং কাকার ফার্স্ট এ্যাসিস্টেন্ট বিষ্টু মিত্তিরকেই। "তমান্না " ছবির জন্যও কাকার নির্দেশ মতো আবহসংগীতের পরিকল্পনা , মিউজিক এ্যারেঞ্জমেন্ট , সমস্ত কিছুই কয়েকদিনের মধ্যেই আমি আর বিষ্টু দা মিলে করে ফেল্লাম। ছবিতে একটি ডুয়েট গান ছিল -"জাগো আঈ উষা ....।" গানের সিচুয়েশন এবং কথার মুডের ওপর ভিত্তি করে কাকা গানটার মিষ্টি একটা সুর করে দিলেন এবং সেই মতো আমিও গানটার নোটেশন ও মিউজিক এ্যারেঞ্জমেন্ট ইত্যাদি সব কিছু কাজ করে ফেল্লাম। এখন অপেক্ষা শুধু ভালো গায়ক- গায়িকার গলায় গানটাকে তুলে দেয়া। বিপত্তি বাধলো সেখানেই। অনেক খুঁজেও ঐ গানের জন্য উপযুক্ত কাউকেই আর পাওয়া গেলনা। পাওয়া গেল না মানে ,কাকা বিশেষ করে যেমন একটা গলা খুঁজেছিলেন, তেমনটা কিছুতেই আর পাওয়া গেলনা। ওদিকে ছবির কাজ এগিয়ে যাচ্ছে পুরোদমে অথচ গানই রেকর্ড করা যাচ্ছেনা,খুবই ঝামেলা হয়ে গেল। শেষে গায়ক- গায়িকা খুঁজে আমরা সবাই যখন একেবারে

হয়রান , তখন কাকা একদিন বল্লেন ,-" এত খোঁজাখুঁজির আর দরকার নেই , ছেলের গানটা আমি মানাকে দিয়েই গাওয়াবো ।" কাকার কথা শুনে তো আমার সারা শরীরে যেন সেদিন আনন্দের বিদ্যুৎ প্রবাহ বয়ে গিয়েছিল। গান গাইতে পারলেও এতদিন তো শুধু কাকার সহকারী হিসেবে নোটেশন করা , শিল্পীদেরকে গান তোলানো এসবের মধ্যেই আমার গান-বাজনা সীমাবদ্ধ ছিল , সেক্ষেত্রে বম্বে পৌঁছেই এত সহজেই একেবারে প্লেব্যাক করার সুযোগ পেয়ে আমার তো তখন আনন্দের আর সীমা নেই । জীবনের প্রথম প্লে-ব্যাক বলে কথা। আনন্দের সাথে ভেতরে ভেতরে খুব ভয়ও হচ্ছিল তখন , খুব প্র্যাকটিস করতে লাগলাম গানটা -" জাগো আঙ্গ উষা ।" মনে হল এযেন শুধুই একটি ফিল্মী গানই নয় , এযেন সত্যি সত্যিই প্রতীক্ষার অমা পেরিয়ে জীবনের " আহিরী " উষায় আমার নিজেরই জেগে ওঠার শুভ আহ্বান - " জাগো আঙ্গ উষা ...."।

ছেলে তো ঠিক হল, এবার আবার ঝামেলা হল মেয়ের গলা নিয়ে। কারো গলাই ঐ গানের জন্য কাকার আর পছন্দ হয়না। শেষে অনেক খোঁজাখুঁজির পর একদিন ত্রিবেদী জী না কে যেন এগার- বার বছরের একটি ফুট ফুটে মেয়েকে কাকার কাছে নিয়ে এসে বল্লেন, -" কেষ্টদা , এই একটি নতুন মেয়ে , খুব মিষ্টি গানের গলা। একবার একে দিয়েই চেষ্টা করে দেখুন না। মেয়েটি কিন্তু এই বয়সেই বেশ গায় ।" কাকা শুনলেন ওর গান এবং আশ্চর্য, সত্যি সত্যিই মেয়েটির গলা কাকার পছন্দও হয়ে গেল। আমরাও সবাই খুব তারিফ করলাম যে বা: কি মিষ্টি গানের গলা এর। কাকাও বল্লেন ,- হ্যাঁ , একে দিয়ে চলবে , তুই একে গানটা তুলে দে। যেহেতু এই মেয়েটিই আমার সঙ্গে ডুয়েট গাইবে , এবং দুজনেরই জীবনের প্রথম প্লেব্যাক এটা , তাই গানটা তোলালামও খুব যত্ন করে এবং প্র্যাকটিশও করতে থাকলাম খুব। এভাবে বেশ কয়েক দিন মহড়া চলার পর একদিন গানটি রেকর্ড করা হল। সেই আমার জীবনের প্রথম গান , যেটা রেকর্ডে ধরা হ'ল। বেশ খুশী মনেই আছি। যাক তাহলে আমার গানও শেষ পর্যন্ত রেকর্ড করা হ'ল। কৃষ্ণচন্দ্র দে , শচীন দেব বর্মনের মতো আমার গানের রেকর্ড ও বাজারে বিক্রী হবে এবং চোঙ্ওয়ালা গ্রামোফোনের সামনে বসে মানুষ তাহলে এখন থেকে আমার গানও শুনবে ! মেয়েটির ও দেখলাম জীবনের প্রথম প্লে-ব্যাকের আনন্দে বেশ খুশী খুশী ভাব। এই রকম যখন মনের অবস্থা, তখন হঠাৎই রেকর্ড বাতিল হয়ে গেল। আমাদের গান কাকার পছন্দ হলনা , সুরকারের অপছন্দ হলে তার ওপর তো আর কোন কথা চলেনা। অতএব আবার শুরু হ'ল মহড়া। দোষ ত্রুটি গুলো সংশোধন করে কদিন পরেই আবার সে গান রেকর্ড করা হ'ল । বেশ ভালো গেয়েছি বলেই যেন মনে হল। দুজনেই বেশ সন্তুষ্ট। তবু ভেতরে ভেতরে একটা ভীষণ ভয়ও ছিল। যদি আমাদের গান এবারও কাকার পছন্দ না হয়, যদি রেকর্ড আবারও

বাতিল হয়ে যায়। বেশ ভয়ে ভয়েই আছি। কাকা শুনলেন এবং শুনে এবার তাঁর পছন্দ হ'ল। আমরাও পরষ্পরের দিকে তাকিয়ে স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেল্লাম। যাক আমাদের জীবনের প্রথম গানও শেষ পর্যন্ত রেকর্ড হবার ছাড়পত্র পেল, আমাদের গানও এখন থেকে সত্যি সত্যিই তাহলে ঘরে ঘরে গ্রামোফোনে বাজবে! এই হচ্ছে আমার প্লে-ব্যাক সিংগিংএর গোড়ার কথা। আর সেদিনের সেই ছোট্ট মেয়েটি আমার সাথে ডুয়েট গেয়েই যারও প্লে-ব্যাক সিংগিং এর হাতে খড়ি, সেই ছোট্ট ফুটফুটে মেয়েটিও পরবর্ত্তী কালে হিন্দী ছবির নায়িকা - গায়িকা হয়ে প্রভূত খ্যাতি অর্জন করেছিলেন। মেয়েটির নাম - সুরাইয়া।

মিঃ সি. এম, ত্রিবেদীর লক্ষ্মী প্রোডাকশনের ব্যানারে ''তমন্না'' ছবির কাজ করতে গিয়ে আমরা সেবার উঠেছিলাম ''সায়ান'' বলে একটা যায়গায়। ওখানে একটা ফ্ল্যাটে থাকতাম আমি আর কাকা। অন্যটায় থাকতেন ফনীদা এবং ওনার অন্যান্য assistant রা। এখানে প্রায় মাস দু-এক থাকার পর একদিন হঠাৎ কাকার বন্ধু পরিচালক দেবকী বসু এসে কাকাকে বল্লেন যে, -'' কেষ্টবাবু, কলকাতা থেকে আমার একটা টেলিগ্রাম এসেছে, আমাকে তাই বম্বে ছেড়ে কলকাতা চলে যেতে হচ্ছে। শিবাজী পার্কে আমার যে ফ্ল্যাটটা আছে, আপনি সেটা নিয়ে নিন। কাকা নিয়ে নিলেন এবং এরপর প্রায় টানা '৪৭ সন পর্যন্ত ওখানেই আমরা ছিলাম। গড়ের মাঠের মতো বিশাল ফাঁকামাঠের পাশে শিবাজী পার্কের যেখানটায় আমরা ছিলাম, তার চারপাশে তখন কোন বাড়ীঘর প্রায় ছিলনা বল্লেই চলে। এখানে একটা বাড়ী, তো ঐ দূরে হয়তো আর একটা বাড়ী। এই রকম অবস্থা। রাস্তা ঘাটও কলকাতার তুলনায় খুবই ফাঁকা ফাঁকা। প্রথম দর্শনেই মনটা কেমন যেন খুব দমে গেল। ক্যারিয়ার গড়ার নেশায় এ আমি কোথায় এসে ফেঁসে গেলাম রে বাবা! যত ক্ষণ স্টুডিওতে আছি, কাজ করছি. গান নিয়ে আলোচনা করছি ঠিক আছি। কিন্তু সন্ধ্যেবেলা স্টুডিও থেকে বাড়ী ফিরলেই আমার খুব কান্না পেয়ে যেত। একটু আড্ডা দেবো, একটু খেলবো, সিনেমা দেখবো, তার কোন উপায় নেই, শুধু ঘরবন্দী হয়ে থাকা, এ কীরকম জীবনরে বাবা। তারপর হ'ল গিয়ে বৃষ্টি। বম্বের তখনকার বৃষ্টি, সে এক ভয়াবহ অভিজ্ঞতা। একবার কোন মতে বৃষ্টি শুরু হলেই হ'ল, দিন পনেরোর মধ্যে রদ্দুরের আর মুখ দেখাদেখি হত না। অবিরাম বৃষ্টি পড়েই যাচ্ছে, আর পড়েই যাচ্ছে। এর মধ্যেই আমাদেরকে বের হতে হচ্ছে। এরকম আর কাহাতক পারা যায়! কয়েকদিনের মধ্যেই এমনতর জীবন যাত্রায় এত হাঁপিয়ে উঠলাম যে, ওখানে থাকতে আর ভালো লাগছিল না। একদিন কাকাকেও বলে ফেললাম যে, এখানে আমার একেবারেই আর ভালো লাগছেনা, আমি কলকাতা চলে যাবো। কাকা বল্লেন, -'' সে কী রে! পাগল নাকি! এই লাইফ ছেড়ে তুমি কলকাতা চলে যেতে চাইছ!'' আমি বল্লাম, হ্যাঁ, এই কি একটা লাইফ হল! এভাবে কোন সুস্থ মানুষ

বাঁচতে পারে ! আমি বাড়ী চলে যাবো। কিন্তু কাকা আমার ওসব ছেলেমানুষী কথায় কোন কানই দিলেন না, অনেকটা প্রায় জোর করেই আমায় ওঁর সঙ্গে বম্বেতেই রেখেদিলেন।

লক্ষ্মী প্রোডাকশনের দ্বিতীয় ছবি ছিল "মেরাগাঁও।" পরিচালক প্রফুল্ল রায়, সংগীত পরিচালক বাবুকাকা। অতএব কাকার সাথে সাথে আমিও আবার ছবির কাজে খুবই ব্যস্ত হয়ে পড়লাম। কাকা নিজে যেমন এক নাগাড়ে ঘন্টার পর ঘন্টা কাজ করতেন, তেমনি আমাদেরকেও সেই মতো খুব খাটাতেন। তখন এত খাটতে হত যে, নতুন জায়গার ঐ একাকিত্ব, ঐ ক্লান্তিকর জীবনযাত্রা ওসব গুলো বসে ভাববারও তখন আর ফুরসৎ পেতাম না। মানে এককথায় সদ্য ছেড়ে আসা কলকাতার জীবনের জ্বলজ্বলে স্মৃতি ফিকে হয়ে গিয়ে ক্রমশ প্রকট হয়ে উঠেছিল বম্বের কর্মক্ষেত্রের কাজের তাগিদ। ততদিনে কাকার সাথে থেকে থেকে সংগীত পরিচালনার কিছু কিছু কাজও আমি বেশ শিখে গেছি। কাকা যখন আমার ওপর অনেকটাই নির্ভর করতে লাগলেন, শিল্পীদেরকে গান তোলানো ইত্যাদি কিছু কিছু কাজকর্ম যখন নির্দ্বিধায় আমার ওপর ছেড়ে দিতে লাগলেন, তখন ভেতরে ভেতরে আমার বেশ একটু ইয়ে, মানে বেশ একটু অহংকার মতো এসে গেল, এবং সেই সঙ্গে অহংকারের আজন্ম সাথী সামান্য ইর্ষাও। মনে মনে শুধু ভাবছি কি করে কাকার ফার্স্ট এ্যাসিস্টেন্ট হওয়া যায়, কি করে বিষ্টু মিত্তিরের জায়গাটা দখল করে নেয়া যায়। খুব ঈর্ষা এসে গেল বিষ্টু মিত্তিরের ওপর। মনে মনে ব্যাপারটা নিয়ে এত গুমরাতে থাকলাম যে একদিন কি একটা ঘটনায় সেটা একেবারে বার্স্ট হয়ে গেল। কাকাকে সোজাসুজি বলেই ফেল্লাম, -" আচ্ছা, বিষ্টু মিত্তির এমন কী বেশী পারে, যা আমি পারিনা ? তবে আমি কেন ফার্স্ট অ্যাসিস্টেন্ট হতে পারবো না ?" আমার মুখে ওরকম নীচু মনের কথা শুনে কাকা সেদিন মনে মনে আমার ওপর খুবই বিরক্ত হয়েছিলেন। বেশ রাগত ভাবেই বল্লেন, -" তুমি এখনও গান বাজনার অনেক কিছুই জানোনা, অনেক কিছুই পারোনা, ডিস্ট্রিবিউশনটা একদম জানো না - ওটা খুবই ভাইটাল জিনিস ওসব শিখতে সময় লাগবে। নিষ্ঠা নিয়ে কাজ করে যাও, সব শিখতে পারবে । মনে রেখো envy is ignorance. এনভির দ্বারা কোনদিনই তুমি বড় হতে পারবে না। আমি খুবই দুঃখিত যে আমার সাথে এতদিন কাজ করার পরও তোমার মুখ দিয়ে এরকম নীচু মনের কথা বের হতে পারলো ! " কাকার ওরকম ধমক খেয়ে সেদিন খুব লজ্জা পেলাম। ভীষণ অনুশোচনা হল, কেন বোকার মতো এরকম কথা বলে কাকাকে এভাবে আঘাত দিলাম। নিজের ওপরই নিজের খুব রাগ হল। তবে একটা কথা ঠিক, সেটা আমার জীবনের একটা খুব বড় শিক্ষা হয়ে গেল । সে ভুল জীবনে আর কোনদিনই আমি করিনি।

আমার কাকাই শুধু নয়, তখনকার দিনের প্রায় প্রত্যেক সংগীত

পরিচালকের মধ্যেই এই উন্নত মানসিকতা লক্ষ্য করা যেত। তাঁরা প্রত্যেকেই চাইতেন যে কি করে সম্ভাব্য উৎকৃষ্ট বস্তুটি শ্রোতাদের সামনে তুলে ধরা যায়, কি করে যোগ্য ব্যক্তিটির যোগ্যতার মর্যাদা দিয়ে উৎকৃষ্ট সৃষ্টিকে আরো উৎকৃষ্টতর করে তোলা যায়। যে কারণেই স্বজন পোষণ ব্যাপারটা তখন প্রায় কোন প্রাধান্যই পেত না। উৎকৃষ্ট গান -বাজনা তৈরী করাই ছিল পরিচালকের একমাত্র লক্ষ্য। তা নাহলে কবে বিষ্টু মিত্তিরকে হটিয়ে দিয়ে সে যায়গায় আমার রাজ্যাভিষেক হয়ে যেত। কিন্তু বাস্তবে আদৌ তো হয়নি।' কাকা - ভাইপোর সম্পর্ক, সেটা বাড়ীতে। স্টুডিওতে তুমি হলে আর পাঁচ জনের মতই বেতনভুক একজন সাধারণ কর্মচারী মাত্র। সেখানে যোগ্যতার পরীক্ষা দিয়েই তোমাকে তোমার নিজের স্থান করে নিতে হবে। কৃষ্ণচন্দ্র দের নাম ভাঙ্গিয়ে নয়।' এই ছিল কাকার মনোভাব। কিন্তু ঐরকম বয়সে নিজের যোগ্যতার পরিমাপ না করেই এবং কাকার ঐ রকম মনোভাব না বুঝে মামার বাড়ীর আব্দার না হলেও কাকার বাড়ীর আব্দার করতে গিয়ে প্রতি পদক্ষেপেই অন্যদের সামনেই কাকার কাছে এত ধমক খেয়েছি যে বড় হবার রঙ্গিন দিবা স্বপ্ন ভেঙ্গে গিয়ে প্রতি পদক্ষেপেই নিজের যোগ্যতা দিয়ে বড় হবার রূঢ় বাস্তবের মুখোমুখি এসে আমাকে দাঁড়াতে হয়েছে। আমার হয়ে কাকা নিজেতো কোনদিন কাউকে সুপারিশই করেননি, এমনকি নিজের সঙ্গীত পরিচালিত ছবিতেও আমাকে সুযোগ না দিয়ে উনি যখন যাকে উপযুক্ত ভেবেছেন, তাকেই সুযোগ দিয়েছেন, কিন্তু ভাইপো হওয়ার খাতির দেখিয়ে আমাকে কখনো নয়। মনে আছে একবার কি একটা ছবির জন্য উনি একটা দারুণ গান কম্পোজ করে বল্লেন, -" এ গানটার খুব দারুণ সুর করেছি মানা, এটা আমি রফিকে দিয়ে গাওয়াবো। তুমি এক্ষুনি রফিকে গিয়ে একটু বলে এসো যে কাল থেকে ও যেন রিহার্সালে আসে। ওমুক তারিখে রেকর্ডিং হবে।" এত মিষ্টি একটা গান, আর কাকা কিনা গানটা রফিকে দিয়েই গাওয়াতে চাইছে এবং তাও কিনা আমাকেই গিয়ে রফি**মিঞাকে** খবরটা পৌঁছে দিতে হবে! মনটা এত খারাপ হয়ে গেল যে মুখ ফুটে কাকাকে বলেই ফেল্লাম, -" এত মিষ্টি একটা গান, এটা আমি গাইলে কেমন হয় ?" আমার কথা শুনে একটুও দ্বিধা না করে আমার মুখের ওপরই কাকা বলে দিলেন, -" রফির গলাতেই এই মিষ্টি গান আরও মিষ্টি শোনাবে। নিঃসন্দেহে রফি এ গান তোমার চেয়ে বেটার গাইবে," ওরকম স্পষ্ট জবাব শুনে মনে মনে তখন খুবই আঘাত পেলেও রেকর্ডিং এর সময় রফির গলায় ঐ গান শুনেই হাড়ে হাড়ে সেদিন বুঝে গিয়েছিলাম যে কাকার সিদ্ধান্ত সেদিন কত নির্ভুল ছিল। আসলে রফির গলায় instinctive এমন একটা ব্যাপার ছিল, যেটা আমার মধ্যে কোনদিনই আমি খুঁজে পাইনি। আসলে ওটা শিখে কোনদিনই হয়না, জন্মগত ভাবেই ভেতরে থাকতে হয়। যেটা রফির মধ্যে পুরোমাত্রায়ই

ছিল। পরবর্ত্তীতেও এটা আমি দেখেছি, যেমন ওর একটা গান ছিল, - " জিন্দেগী ভর নেহি ভুলেঙ্গে ও বরসাতকি রাত ....।" আহাঃ কি অপূর্ব গাইল সেই গানটা। বরসাত' কথাটাতে ওঁ এমন একটা এক্সপ্রেশন দিত, মনে হত গীতিকার তার লেখায় যতটা ফুটিয়ে তুলেছেন, পরিচালক দৃশ্য রচনার মধ্য দিয়ে যতটা ফুটিয়ে তুলেছেন, রফির গান যেন সেই সমস্ত কিছুকে ছাড়িয়ে আরো দূরে বহু দূরে পৌঁছে গেছে, যেখানে বরসাত মানে শুধুই আকাশ থেকে জলঝড়া নয়, বরসাত মানে প্রেমিকের হৃদয়াকাশে পুঞ্জিত আনন্দ বেদনা ঘন স্মৃতির মেঘ গলে গলে অবিশ্রান্ত ঝরে যাওয়া। আমি তো বারবার স্বীকার করে নিয়েছি যে, না, আমি ঐ গান গাইলে হয়তো ডেফিনেটলি সেটার অন্য একটা ডাইমেনশন হত, অন্য একটা রঙ্ হত, কিন্তু রফি ওটাকে যে জায়গায় নিয়ে পৌঁছে দিয়েছে, আমার তিন জন্মের সাধনায়ও আমি তেমনটা করতে পারতাম না। এককথায় রফি রফিই। ওর মতো গায়ক ভারতবর্ষে কোনদিন হয়নি এবং হয়তো হবেও না আর কোনদিন। ওঁর তুলনা একমাত্র ওঁ নিজেই।

কাকা একের পর এক ছবির সংগীত পরিচালনা করতে থাকলেন এবং তাঁর সহকারী হিসেবে আমিও ছায়ার মতো তাঁকে দিনের পর দিন অনুসরণ করে যেতে থাকলাম। পরিচালনার কাজে এমন ভাবে তখন ডিভোটেড হয়ে গিয়েছিলাম যে আমি যে কোনদিন শেষ পর্যন্ত নিজে গান গাইবো, প্লে- ব্যাক সিঙ্গার হিসেবে নিজেকে প্রতিষ্ঠা করবো, সেকথা অন্যরা তো দূর, আমি নিজেও তখন প্রায় ভুলতে বসেছিলাম। এই রকম যখন অবস্থা, তখন একদিন সকাল বেলা বম্বের প্রকাশ পিকচার্স এর মালিক গুজরাটী ভ্রাতৃদ্বয় শঙ্কর রাও ভাট্ ও বিজয় রাও ভাট্ এবং প্রখ্যাত উচ্চাঙ্গসংগীত শিল্পী নারায়ণ রাও ব্যাসের বড় দাদা তখনকার দিনের বিখ্যাত সংগীত পরিচালক শঙ্কর রাও ব্যাস, এঁরা সব আমাদের ঐ শিবাজী পার্কের বাড়ীতে এসে কাকাকে বললেন যে, তাঁরা " রামরাজ্য " বলে একটা হিন্দী ও মারাঠী ডবল ভার্সানের ছবি করছেন এবং তাতে বাল্মীকির চরিত্রে যে রোল করছিল বদ্রীপ্রসাদ জী তার লীপে প্লে- ব্যাক করার জন্য ওঁরা কাকাকে অবশ্যই চান। কাকা ওঁদের সব কিছু শুনে খুব বিনীত ভাবেই বল্লেন যে, -"দেখুন, আপনারা আমার কাছে এসেছেন, এজন্য আমি খুবই কৃতজ্ঞ, কিন্তু আমি তো নিজে রোল না করে অন্যের সুরে কোন ছবিতে প্লে- ব্যাক করিনা, এটা আমার প্রিন্সিপল। সুতরাং বাল্মীকির গানের জন্য আপনাদেরকে অন্য লোক দেখতে হবে।" কাকার কথা শুনে তাঁরা খুবই হতাশ হয়ে পরলেন। বাল্মীকির প্লে-ব্যাক করার মতো ওরকম গায়ক কে আছে আর! কিন্তু অনেক অনুরোধেও কাকা যখন কিছুতেই গাইতে রাজী হলেন না, তখন ওঁরা বল্লেন, -" তাহলে বাল্মীকির লীপে মানানসই কোন গায়কের নাম অন্তত আপনিই আমাদেরকে সাজেস্ট করে দিন।" কাকা একটু ভেবে নিয়ে বল্লেন, - " মানাকে দিয়ে একবার

চেষ্টা করে দেখুননা। আমার তো মনে হয় আপনারা যা চাইছেন , মানার কাছ থেকে তা পেয়ে যাবেন। ” ওরা বল্লে ,- “ মান্না ! কে সে, কোথায় থাকে ! ওরকম কোন গায়কের নাম তো আমরা শুনিনি।” কাকা বল্লেন,- “আরে, আমার ভাইপো মানা, এই তো বসে রয়েছে সে আমার পাশে।” এতক্ষণ তো সেভাবে ওরা আমাকে লক্ষই করেনি। কাকা আমার কথা বলতেই অবাক চোখে আমাকে আপাদমস্তক দেখে নিয়ে বল্লেন ,- “ ই-য়ে ! ইয়ে ছোকরা ! ইয়ে ক্যায়সে গায়েঙ্গে !! ইতনা .... !! হামকো চাহিয়ে বাল্মীকিকে লিয়ে আপ য্যায়সা depth ওয়ালা গলা।” কাকা বল্লেন, -“ আপ লোগ কোসিস তো কিজিয়ে। অগর পসন্দ্ না হো তো মৎ লিজিয়ে। ” তখন শঙ্কর রাও ব্যাস আমার দিকে তাকিয়ে বল্লেন,- “ কিঁউ বেটা গাওগে ?” আমি বল্লাম ,- “ হাঁ , হাঁ , কিউ নেহি। চাচাজি চাহেঙ্গে তো ম্যায় জরুর গাউঙ্গা। ” ভাবখানা এমন যে ভাই আর কি হবে, পছন্দ না হলে না হয় লোক মার্ফৎ একটা খবরই পাঠিয়ে দেবে , এর বেশী তো আর কিছু হবে না। ওদিকে ওঁরাও আমাকে বাদ দিতে হবে ভেবেও শুধু কাকার কথা রাখতেই যেন দু-একদিন পর আমাকে স্টুডিওতে ডেকে পাঠালেন।

শঙ্কর রাও ব্যাসজী আমাকে তোলাতে লাগলেন তার সুর করা বাল্মীকি চরিত্রের সেই গান - “ ভারত কি এক ....।”কাকার সঙ্গে কাজ করতে করতে নোটেশন করার ব্যাপারটা তো আমার তখন খুবই রপ্ত হয়ে গিয়েছিল , বিশেষত ঐ বিশেষ ধরণের শর্ট হ্যান্ড নোটেশন, যেটা কলকাতার মিউজিশিয়ানরা তৈরী করেছিলেন, সেটাও আমি তখনি খুব দ্রুত লিখতে পারতাম। তাই শঙ্কর রাওজী যখন প্রথম পুরো গানটি আমাকে গেয়ে শোনাতে লাগলেন , আমি তখনি গানটার শর্ট হ্যান্ড নোটেশন নিতে শুরু করে দিলাম। উনি বল্লেন ,- “ বো ক্যায়া কর রহে হো ?” বল্লাম-“ গানটার নোটেশন নিচ্ছি।” আমার জবাব শুনে এবার শঙ্কর রাওজী কেমন যেন অবাক হয়ে গেলেন। মনে হল , আমার ওপর এতক্ষণে ওনার যেন কিছুটা আস্থা এসেছে কারন Boss এর ডিকটেশন নেয়ার মতো গান শুনে শুনে শর্টহ্যান্ড নোটেশন নেয়ার ব্যাপারটা তখনো বম্বেতে সেভাবে চালু হয়নি। ওটা কলকাতার মিউজিশিয়ানদেরই সৃষ্টি এবং কলকাতাতেই ওটা প্রচলিত ছিল। এই নোটেশন আমি শিখেছিলাম কাকার সাথে কাজ করতে গিয়ে। কাকার সঙ্গে যারা কাজ করতেন, এই যেমন কালীবাবু , মথুরবাবু, এদেরকে দেখতাম এই shorthand notation করতে। এতে তালটা হয়তো লেখা যায়না ঠিকই , কিন্তু কোন গান শুনতে শুনতেই তার সুরের outline টা এতে লিখে নেয়া যায়। এই নোটেশন পদ্ধতিটা ব্যাপকভাবে চালু হলেই হয়তো ভাল হ’ত। কিন্তু হয়নি। আজকালকার মিউজিশিয়ানরা বোধহয় এর খোঁজও রাখেননা। যাই হোক, শঙ্কর রাও জী গান শেষ করে বল্লেন ,- “ লো বেটা গাও ,জরা গাকে তো শুনাও ক্যায়া নোটেশন লিয়া। ” এখানে একটা কথা বিশেষ করেই

বলা দরকার যে, ওঁরা যেদিন বাল্মীকির প্লে-ব্যাকের জন্য কাকার কাছে এসেছিলেন, সেদিন একটা জিনিস মোটামুটি আমি বুঝে গিয়েছিলাম যে , বাল্মীকির গানের জন্য প্র্যাকটিক্যালি ওদের চাহিদাটা কি । কাকার গলার যে ডেপ্‌থ, ঐ যে উদাত্ত- দরাজ ভঙ্গিতে বিশুদ্ধ উচ্চারণ , বাল্মীকির গলায় ওরা আসলে ওই জিনিসটাই খুঁজছিলেন । আমার দীক্ষাগুরু তো সেই কাকাই । গলাটাও ঐ বয়সেই বেশ দরাজই ছিল এবং গান ও তো গাইতাম তখনও কাকারই স্টাইলেই , তাই শঙ্কর রাও জী ফরমাশ করতেই ওঁদের চাহিদার কথা মাথায় রেখে গান শুরু করে দিলাম । বাতিল হতে পারি এটাতো জানাই ছিল , তাই নির্ভয়ে বেশ খোস মেজাজেই গানটা গেয়ে দিলাম । কিন্তু আশ্চর্য , বাতিল হওয়ার তো কোন প্রশ্নই উঠল না, উপরন্তু আমার গান তাঁর খুব পছন্দ হ'ল , বিশেষত বাল্মীকির মতো ওরকম ভারিক্কী চরিত্রের জন্য আমার মতো ওরকম একান্ত নবীনের ঐ কৃষ্ণচন্দ্র মার্কা দরাজ গলার গান তাঁর এতভাল লেগে গেল যে , গান শেষ হতেই দু- হাতে আমাকে জড়িয়ে ধরে একেবারে প্রায় যেন চিৎকার করে উঠলেন,- " আরে তুম তো কামাল কর দিয়া মান্না ।" - বুঝলাম পরীক্ষায় আমি উতরে গেছি। শুধু উতরে যাওয়াই নয় ,একেবারে প্রথম শ্রেণীতে প্রথম হয়ে গেছি। কিন্তু নির্বাচন পর্ব সেখানেই শেষ হয়ে গেল না । দ্বিতীয় পরীক্ষা তখনো বাকী ছিল । শুনলাম প্রকাশ পিকচার্সের মালিক বিজয় ভাট্ নাকি গান-বাজনার ব্যাপারে খুবই খুঁতখুঁতে লোক । তাঁর ছাড় পত্র না পেলে নাকি সব ছাড়পত্রই বৃথা । তাই আমাকে এবার নিয়ে যাওয়া হ'ল বিজয় ভাটের ঘরে । মানে অনেকটা যেন সেই লিখিত পরীক্ষায় পাশ করার পর ভাইভা ভোসিতে বসার মতো ব্যাপার আর কি । বিজয় ভাট্রের সামনে বসে আবার গাইলাম সেই গান - " ভারত কি এক .... "। প্রথম পরীক্ষায় পাশ করে গিয়েছিলাম বলে দ্বিতীয় পরীক্ষায় ফেল হয়ে যাবার আশঙ্কায় সামান্য ভয় তো মনে মনে ছিলই । কিন্তু না । দ্বিতীয় পরীক্ষায়ও সসম্মানেই পাশ করে গেলাম । বিজয় ভাট্রেরও আমার গান খুব পছন্দ হয়ে গেল । বল্লেন ,- " আরে মান্না , বাল্মীকিকে লিয়ে তুঝকো হি গানে পড়েগা ইয়ে গানা । ঔর উও ভি হিন্দী - মারাঠী দোনো ভার্সানকে লিয়ে হি । " আমি বল্লাম ,-"লেকিন মুঝে তো মারাঠী বোলনা নেহি আতা । " ওরা বল্লেন ,-" ও কোই problem হি নেহি । যো ইতনা আচ্ছা গানা গা লেতে হ্যায় , উসকে লিয়ে ভাষা কোই সমস্যা হি হো নেহি সকতা । তুম্হারা মারাঠী শিখনে কা ইন্তেজাম জল্দ হি কিয়া যায়েগা । ঘাবরানে কি কোই বাত নেহি ।" এবং সত্যি সত্যিই পরদিন থেকেই ওদের ব্যবস্থা মতো দাদারে বি বি সি আইতে আমাকে রেগুলার মারাঠী শিখতেও যেতে হয়েছিল বেশ কিছুদিন ।

তমান্না , রামরাজ্য ইত্যাদি কিছু কিছু ছবিতে গান গাওয়ার সুযোগ পেলেও বাস্তবিক প্রথম ব্রেকটা পেয়েছিলাম "অমর ভূপালী" ছবিতে গান গেয়ে । এটি ছিল মূলত একটি গানকেন্দ্রিক ছবি । ছবিটা বাংলা এবং

Deba Prasad Das

মারাঠী দুটো ভার্সানে তৈরী হয়েছিল। মারাঠী ভার্সানটা বানিয়ে ছিলেন ভি.শান্তারামজী এবং বাংলাটা করেছিলেন আমাদের পুতুলদা অর্থাৎ নীতিন বোস। সংগীত পরিচালক ছিলেন বসন্ত দেশাই। মারাঠী ভার্সানের গানগুলো গেয়েছিলেন বম্বেরই একজন খুব নামকরা মারাঠী শাস্ত্রীয় গায়ক , তাঁর নাম ছিল পন্ডিত রাওনাগরকর। আর বাংলা গানগুলো গেয়েছিলাম আমি। গানগুলো লিখেছিলেন গৌরীপ্রসন্ন মজুমদার। ভূপালী রাগটা আমাদের শাস্ত্রে যদিও সন্ধ্যাকালীন রাগ হিসেবে চিহ্নিত , কিন্তু মারাঠীদের যে একটা বিশেষ গায়ন রীতি , তাতে ওদের মতে ওটা হ'ল সকাল বেলার রাগ এবং ওদের গায়নের গুণে ওতে সুন্দর একটা সকালের flavour থাকতো। এই ভূপালী রাগটাকে কেন্দ্র করেই তৈরী হয়েছিল এই " অমর ভূপালী" ছবিটা। মারাঠী গায়কীতো এমনিতেই খুব টিপিক্যাল ধরনের। বসন্ত দেশাই গানগুলো তুলে দিয়ে বল্লেন ,- " দ্যাখো তুমি তো বাঙ্গালী ঘরের ছেলে , মারাঠী গায়কীতে গাইতে তোমার হয়তো অসুবিধে হবে। তুমি তোমার বাংলা ঘরানার মতো করেই গেয়ে দাও, চলে যাবে।" আমি বল্লাম ,-" কেন ? মারাঠী জীবন নিয়ে ছবি , মারাঠী সব কিছু, শুধু বাংলা ভার্সানে হচ্ছে এই যা , তাতে আমি কেন শুধু গায়কীর বেলায় বাংলা গায়কীতে গাইব ! আমি মারাঠী গায়কীতেই গাইবো। " তবে হ্যা, আপনাদের ঐ যে টিপিক্যাল মারাঠী গায়কী, ঐ যে প্রত্যেক কথার শেষে সুরের একধরনের কম্পন , কারণে-অকারণে তান জুড়ে দেয়া , ওটা শুনতে ভালো লাগলেও গানের মধ্যে এ জিনিসগুলোর কোন জাস্টিফিকেশন আমি খুঁজে পাইনা। বিশেষত বাংলা গানে ও জিনিস একেবারেই বেমানান। তাই ঐ কম্পনগুলোই আমি শুধু বাদ দেবো। তবে সেটা গাইতে না পারার জন্য নয় , গানটাকে সুন্দর করার জন্যই"। হয়তো একটু আধটু ভুল হ'ল ঠিকই , তবু ঐ মারাঠী ঢঙেই গেয়েছিলাম ,- "আনন্দ-কন্দ প্রভাত বেলি , ওঠো ওঠো পোহালো রাতি ", " ঘনশ্যাম সুন্দর শ্রীরাধা " ইত্যাদি বেশ কিছু গান। এবং বম্বে-কলকাতা সর্বত্রই খুব জনপ্রিয় হ'ল এই সব গান। সবাই বল্লে ,- " বাঃ কি সুন্দর গান করেন এই ভদ্রলোক, কি মিষ্টি দারুণ দরাজ গলা এর.......।" ইত্যাদি ইত্যাদি। মানে এক কথায় নবাগত শিল্পী হিসেবে আমার তখন বেশ নাম ডাক হয়ে গেল " ঘনশ্যাম সুন্দর শ্রীরাধা'র কৃপায়। কিন্তু না। এতকিছুর পরও মান্না দেকে ভারতবর্ষের একজন শ্রোতাও কিছুতেই চিনতে পারলেন না। অবশ্য চিনবেই বা কি করে , আমি তো তখনও মান্না দে হয়ে উঠিনি। তখনো যে আমি কলকাতার সিমলা পাড়ার প্রবোধচন্দ্রই রয়ে গেছি। রেকর্ডে যে আমার ঐ কলকাতাইয়া প্রবোধচন্দ্র নামটাই তখনো ছাপা হত, মান্না নামটা নয়। মায়ের আদরের ' মানা' তামান্নায় গান গাওয়ার সুবাদেই প্রথম বোম্বেটেদের মুখে ' মান্না ' বলে প্রতিষ্ঠা পেলেও মুখের গন্ডি পেরিয়ে একেবারে ছাপার অক্ষরে সেই নাম পাকা পাকি প্রতিষ্ঠিত হতে কেটে গিয়েছিল আরো প্রায় বেশ কয়েকটি বছর। এতে আমার কোনই ভূমিকা না

থাকলেও এটা ঠিক যে এই ঘটনায় আমি মনে মনে বেশ খুশীই হয়েছিলাম সেদিন। কারণ প্রবোধ চন্দ্র নামটা আমার নিজেরই কোনদিন তেমন পছন্দ ছিল না।

একনাগাড়ে প্রায় চার -পাঁচবছর বাড়ীর বাইরে থেকে এবং এত এত ছবিতে সংগীত পরিচালনার কাজে এত পরিশ্রম করে করে হঠাৎই কাকার খুব শরীর খারাপ হয়ে গেল এবং কাকাকে নিয়ে আমি কলকাতায় ফিরে এলাম। সম্ভবত সেটা আমাদের স্বাধীনতা লাভের দু-এক মাস আগে পরেরই কথা। কাকা সেই কলকাতায় ফিরে এলেন, সেটাই মোটামুটি বম্বের পাট চুকিয়ে পাকাপাকিভাবে তাঁর কলকাতায় ফিরে আসা। কাকার সাথে সাথে আমাকেও তো কলকাতায় ফিরে আসতে হল ঠিকই, কিন্তু আমার মন পড়ে রইল ঐ বম্বেতেই।কারণ গোটা কয়েক ছবিতে প্লে-ব্যাক করা, দু-একজন সংগীত পরিচালকের সাথে এ্যাসিস্টেন্ট হিসেবে কাজ করা, ইত্যাদি করে করে সবে যখন সামান্য কিছু প্রতিষ্ঠার মুখ দেখছি, আরো বড় কিছু করার জন্য তৈরী হচ্ছি, ঠিক তখনি কাকার সাথে সাথে আমাকেও বম্বে ছেড়ে চলে আসতে হ'ল। কলকাতায় কিছুতেই আর মন বসছিল না। এদিকে বাড়ীর লোকেরাও কিছুতেই আমাকে আর বম্বেতে ফিরে যেতে দিতে রাজী হচ্ছিলেন না। সবার মুখে সেই এক কথা, বম্বে নাকি খুবই খারাপ জায়গা, ওখানে একা একা থাকলে আমি নাকি একেবারে বখে যাবো। এমনকি বাবুকাকাও তখন বম্বেতে আমার একা থাকার ব্যাপারটা কিছুতেই মন থেকে সায় দিতে পারছিলেন না। এই রকম যখন অবস্থা, তখন হঠাৎই একদিন বম্বে থেকে কাকার কাছে ফনীদার একটা টেলিগ্রাম এল যে তাঁর নতুন ছবিতে মিউজিক দিতে নিউথিয়েটার্সের হরিপ্রসন্ন দাস বম্বে আসছেন এবং হরি প্রসন্ন দাসের সহকারী হিসেবে আমাকে তাঁর খুব দরকার। তাই কাকা যেন অতি সত্বর আমাকে বম্বে পাঠিয়ে দেন। ফনীদার টেলিগ্রাম পেয়ে কাকা আর না করতে পারলেন না এবং বাড়ীর অন্যান্যদেরকেও উনিই কোনভাবে বুঝিয়ে সুঝিয়ে কয়েকদিনের মধ্যেই আমাকে বম্বের উদ্দেশ্যে রওনা করিয়ে দিলেন। এখানে একটা কথা বিশেষ করে বলবার যে, বাড়ীর সকলেই যখন আমার বম্বে ফিরে যাবার ব্যাপারে ঘোর আপত্তি করেছিলেন, তখনও আমার মা কিন্তু স্পষ্ট করেই আমায় বলে দিয়েছিলেন,-" তুই যদি মনে করিস যে বম্বে যাওয়াটা তোর জন্য একান্ত জরুরী, তবে তুই চলে যা। নিজের ভালো মন্দ বোঝবার মতো যথেষ্ট বয়স তোর হয়েছে। তুই চলে যা।" আমার জীবনে আমার মায়ের ভূমিকা নিয়ে আগেও বলেছি, এখনো বলছি, উনি যে কতটা আধুনিক ছিলেন, কতটা সত্যিকারের মায়ের মতো মা ছিলেন, ভাবলে এখনো আমি অবাক হয়ে যাই।

সবার অনুমতি নিয়ে সপ্তাহ খানেকের মধ্যেই আমি আবার বম্বে ফিরে এলাম এবং উঠলাম গিয়ে সোজা ফনী মজুমদারের বাড়ী। গিয়ে দেখি হরিপ্রসন্ন দাসও তখন ওখানেই আছেন। ফনীদা তো তখনো বিয়ে থা

করেন নি ,তাই কলকাতা থেকে বম্বে আসা অনেকেই তখন নিঃসঙ্কোচে ফনীদার ওখানেই গিয়ে উঠতেন। সেবারে আমিও প্রথম সেখানেই গিয়ে উঠলাম। বম্বেতে তখন আমার একজন খুব ঘনিষ্ঠ দাদা কাম বন্ধু ছিলেন নন্দ বাবু মানে নন্দ মজুমদার। উনি ব্যাঙ্কে চাকরি করতেন। নন্দবাবুর আর একটি পরিচয় হচ্ছে , উনি ছিলেন গীতিকার গৌরীপ্রসন্ন মজুমদারের জ্যাঠতুতো দাদা। ফনীদার বাড়ীতে দিন কয়েক থেকে তারপর আমি নন্দবাবুর ফ্ল্যাটে shift করে নিলাম। নন্দবাবুর সাথে ঐ ফ্ল্যাটে আমি বহুদিন ছিলাম। যাইহোক , আমি যখন বম্বে গিয়ে পৌঁছলাম, তখন কাজ চলছিল নন্দলাল যশোবন্তলাল পরিচালিত লক্ষ্মী প্রোডাকশনের " কাদম্বরী " ছবির। এ ছবির অভিনেতা-অভিনেত্রীদের মধ্যে ছিলেন শান্তা আপ্তে , পাহাড়ী সান্যাল প্রমুখ অনেকেই শান্তা আপ্তে তো নিজে গান গাইতে পারতেন। " কাদম্বরী " র জন্য তখন রোজ দুবেলা তাঁকে গান তোলাতে হ'ত। গান নিয়ে প্রচুর আলাপ-আলোচনাও হত। বেশ একটা অন্য রকম পরিবেশ। কখনো কখনো পাহাড়ীদাও এসে আমাদের আসরে যোগ দিতেন । খুবই ভালো মানুষ ছিলেন পাহাড়ী দা। ওরকম গানের সমঝদার , দিলদার মানুষ খুঁজে পাওয়া খুব মুস্কিল। যেখানে যেতেন একেবারে মাতিয়ে দিতেন। শুটিং এর মাঝে একটু ফাঁক পেলেই হ'ল , ছুটে এসে বলতেন ,-" আয় মানা , একটু প্র্যাকটিস করে নি। "
এভাবেই দেখতে দেখতে কেটে গেল আরো তিন চারটে বছর। ইতিমধ্যে ক্ষেমচাঁদ প্রকাশ, শ্যাম সুন্দর ,অনিল বিশ্বাস , শচীণ দা , শ্রীরাম চন্দ্র প্রমুখ বম্বের প্রায় সমস্ত পরিচালকদের সাথে কাজ করে করে ,প্রত্যেকের সুর করার স্বতন্ত্র্যধারার বৈশিষ্ট্য দিয়ে নিজেকে শিক্ষিত করে এককভাবে কাজ করারও একটা তাগিদ ততদিনে আমার মধ্যে তৈরী হয়ে গিয়েছিল। অ্যাসিস্ট্যান্ট হিসেবে কাজ করার সময়ও অবশ্য বহু গানের সুর আমাকে করতে হয়েছিল , কিন্তু সেগুলোর স্বীকৃতি আমার জোটেনি , হয়তো কোন অ্যাসিস্ট্যান্টের কপালেই কোনদিন তা জোটেনা। কারণ অ্যাসিস্ট্যান্ট পদটাই কোন একজন উপরওয়ালার সাথে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ সুতোয় বাঁধা থাকে।

আমি কোন দিনই এ-গ্রেড সংগীত পরিচালক হতে পারিনি। বরাবরই বি-গ্রেড থেকে গেছি। সে কারণেই ভালো কোন ছবিতে সুর করার কোন সুযোগ কোনদিনই আমার ভাগ্যে জোটেনি। কম বাজেটের যত সব আজে বাজে ছবিতে সুর করার অফার আসতো। ইন্ড্রাষ্ট্রিতে টিঁকে থাকার তাগিদে , চোখকান বুজে সেসব কাজও তখন নির্দ্বিধায় আমি করে গেছি। সে সব ছবি কলকাতার দর্শকরা দেখারই সুযোগ পায়নি কোনদিন। কারণ তখনকার দিনে যে সব হিন্দী ছবি কলকাতায় দেখানো হ'ত, সেগুলো বেশীর ভাগই ছিল নিউ থিয়েটার্সের সায়গল - লীলা দেশাই ওদের অভিনীত ছবি, অথবা বম্বে টকিজের অশোক কুমার - দেবীকা রানী ওদের "কংগন", " বন্ধন " ইত্যাদি ছবি , নয়তো ভি. শান্তারামের প্রভাত

সেই সব ছবিও বেশীর ভাগই হ'ত বাংলা ছবিরই হিন্দী ভার্সান ।এসব ছাড়া অন্যান্য ছবিও সেসময় বম্বেতে প্রচুর হত। কিন্তু সেসব ছবি কস্মিনকালেও কলকাতার কোন হলে চলত না। তেমন ধরনের ছবিতেই আমি তখন সুর করার সুযোগ পেতাম। সেই সব ছবির কথা অন্যরা তো দূর , আমি নিজেও অনেক ছবির নামই ভুলে গেছি। যেমন " চমকী "," শুক রাম্ভা", ' শিব কন্যা ' , '.জয় মহাদেব' , ' গৌরী পূজা' , 'রিশতে কি দীবার' এরকম অনেক গুলো ছবিতেই তখন আমি সংগীত পরিচালনা করেছিলাম। কিন্তু সেগুলোর বেশীর ভাগই বাজারে তেমনভাবে চলেনি। এগুলো ছাড়া আরও কিছু ছবিতেও সেসময় আমি সুর করেছিলাম , যেগুলো আদৌ কোনদিনই রিলিজও করেনি। নামও ভুলে গেছি সেগুলোর। যেমন প্রভাত মুখার্জীর ছবি " সোনেল" , খুবই ভালো লেগেছিল সোনেলের সংগীত পরিচালনা করে। লতাকে দিয়ে গাওয়ানো ঐ " হালকা হালকা .... " গানটা বা আমার নিজের গাওয়া গানটা, খুবই ভালো কাজ হয়েছিল। লোকেও গান শুনে খুব প্রশংসা করল। কিন্তু ছবি আর রিলিজই হল না। সোনেলই আমার সংগীত পরিচালিত শেষ হিন্দী ছবি। হিন্দী ছাড়া বাংলাতেও " শেষ পৃষ্ঠায় দেখুন " ,'প্রেয়সী ', ' বাবুমশাই ' , ' রামধাক্কা', 'লোলিতা' , 'কত ভালোবাসা ' ইত্যাদি বেশ কিছু ছবিতে এপর্যন্ত আমি সংগীত পরিচালনা করেছি । কিন্তু নিঃসঙ্কোচে স্বীকার্য যে , সংগীত পরিচালনা দিয়েই আমার ক্যারিয়ার শুরু হলেও গান গেয়ে আমি শ্রোতাদের যত কাছাকাছি আসার সুযোগ পেয়েছি ,সংগীত পরিচালনা করে ঠিক ততটা কাছাকাছি আসার সৌভাগ্য আমার হয়নি। পরিচালনার কাজে কোনদিনই এতটুকু ফাঁকিও আমি দিইনি এবং আমার কাজ জনপ্রিয়তা লাভ না করলেও সৃষ্টির আনন্দে আমি নিজে অন্তত তৃপ্তি পেয়েছি। জীবনের অভিজ্ঞতায় আমি দেখেছি জনপ্রিয়তার সাথে ভালো কাজের সম্পর্কটা প্রায়শই গাণিতিক সম্ভাব্যতার সূত্রে মেলে না। যদি মিলতো , তবে রাজকাপুরের " মেরা নাম জোকার " হয়তো কোনদিনই বক্স অফিসে ফ্লপ করতো না।